দৈনিক জনকণ্ঠ ৪।

তারিখ ... JUN. 20 1999
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ৪

এসএসসি পরীক্ষার ফল

একসময় ছিল যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায়, শহরের অলিগলিতে, এমনকি গ্রামেগঞ্জেও মানুষ যেন এক ধরনের উৎসবে মেতে উঠত। যার নিজের ছাত্রছাত্রী অথবা আত্মীয়স্বজনও ঐ পরীক্ষার পরীক্ষার্থী থাকত না তারা পর্যন্ত এই উৎসবে যোগদান করত। নিজের পয়সায় খবরের কাগজ কিনত পরিচিতদের ফলাফল জানিয়ে দিয়ে আনন্দ পেতে এবং এক ধরনের সুখ ও তৃপ্তি পাবার জন্য। এই ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫-৫৬ পর্যন্ত সময়কালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা ছিল যেন সকল পরিবারের পরীক্ষা। আনন্দের ভাগীদার সবাই হতো। তখনও যে নকল করার রীতি ছিল না তা নয়। কিন্তু যারা নকল করতে হাতেনাতে ধরা পড়ত, তারা সরাসরি শিক্ষকদের পা জড়িয়ে ধরত। সমাজ তাদের ঘৃণা করত, পরিবারেও তার জন্য অনুশোচনার অন্ত থাকত না। এমনকি সে যুগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ার গ্লানি সহ্য করতে না পেরে কোন কোন ছাত্র আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে। এই ছিল সমাজের মূল্যবোধ। শিক্ষক-শিক্ষিকারা সে যুগে যেন ছিলেন সততা, আদর্শ ও মূল্যবোধের জ্বলন্ত উদাহরণ। দুর্ভাগ্যবশত, আজ সেই সব দিনের কথা কল্পকাহিনীতে পরিণত হয়েছে। আর আজকে পরীক্ষার সময় বস্তায় বস্তায় নকল প্রাপ্তির খবরও সংবাদপত্রে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তবুও পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফল প্রকাশের রীতিটা তো চালু রাখতেই হয়। এই প্রেক্ষাপটে গত বৃহস্পতিবার চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। দেশের পাঁচটি শিক্ষাবোর্ড এক সঙ্গে এই ফল প্রকাশ করেছে। গোটা দেশের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পাস করেছে ৫৪ দশমিক ১৪ জন। মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের এই যুগে এই ফলাফলকে সন্তোষজনকই বলা চলে। এবার অনেক দিন পরে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে এসএসসি পরীক্ষায় মেয়েরাই মেধাবী মুখ হিসাবে এগিয়ে থাকত। কিন্তু এবার মেধা তালিকায় ছাত্রদেরই প্রাধান্য দেখা গেছে।

আরেকটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়, এই যে, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা সাংবাদিকদের কাছে অকপটে বলেছে যে, স্কুল শিক্ষকদের মধ্যে 'কোচিং কালচার' রীতি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া উচিত। তারা জোর দিয়ে বলেছে, শিক্ষকরা স্কুলে পড়ানোর চেয়ে কোচিং এবং প্রাইভেট পড়ানোর প্রতি বেশি আগ্রহী। ফলে শিক্ষকদের কাছ থেকে ছাত্রছাত্রীরা কার্যত সৃজনশীল, কিছুই পাচ্ছে না। অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষিকারা চিত্তের চেয়ে বিত্তের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বেশি। একথা অনস্বীকার্য যে, নামকরা কিছু কিছু সরকারী স্কুল ছাড়া অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষকদের বেতন সম্মানজনকভাবে সংসার প্রতিপালনের জন্য যথেষ্ট নয়। সে জন্য সরকার ও অন্যান্য বিত্তশালী ব্যক্তির কাছে পরিকল্পনামাফিক সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে। কিন্তু যাঁরা মানুষ গড়ার কারিগর, যাঁদের হাতে সৃষ্টি হচ্ছে ভবিষ্যত প্রজন্ম, তাঁদের কিছুটা হলেও ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। এবারও গ্রাম এবং শহরের শিক্ষার মানের বিরাট ব্যবধানের চিত্র দৃষ্টিকটুভাবে ধরা পড়েছে।

মেধা তালিকায় এবারেও ক্যাডেট কলেজ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এবং বড় বড় শহরের হাতেগোনা কয়েকটি এলিট স্কুলের একচেটিয়া প্রাধান্য। অতি সুবিধাভোগী এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি দেশের সাধারণ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। উপরোল্লিখিত স্কুলগুলো ছাড়া মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে রাজধানীর নামী স্কুল সেন্টযোসেফ, উদয়ন, গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুল, হলিক্রস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলের ছেলেমেয়েরা। এ ছাড়া সর্বত্রই দেশের ক্যাডেট স্কুলগুলো অতীতের মতোই পরীক্ষার ফলাফল ভাল করেছে।

এখানে উচিত জাতীয় ভিত্তিতে সরকার ও সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তি ও বিত্তশালীদের সামগ্রিকভাবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধনে এগিয়ে আসা। কারণ জন্মের সময় কেউ কম বা কেউ বেশি মেধাবী ছাত্রছাত্রী হয়ে জন্মায় না। এখানে রবীন্দ্রনাথের সেই কথাটাই মনে পড়ে 'দেহের সমস্ত রক্তই মুখে এসে জমার নাম স্বাস্থ্য নয়।' এই মানবিক দিকটির প্রতি সকলের দৃষ্টি দেয়া জাতির স্বার্থে অপরিহার্য। শুধুমাত্র সার্টিফিকেট লাভের জন্য, ভবিষ্যতে চাকরিবাকরির সুযোগ-সুবিধার জন্য এই বৈষম্য গোটা সমাজকে পিছু ঠেলে দেবে। আমরা মেধাবী সকল ছাত্রছাত্রী ও পরীক্ষায় কৃতকার্য সকলের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি সৃজনশীল শিক্ষাদানের প্রতি সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নকল করে, শিক্ষকদের মারধর করে, মস্তানি করে অথবা সামাজিক অবস্থার জোরে ফলাফল ভাল করতে পারলেও তা পরিণামে সমাজের অবক্ষয়ই ত্বরান্বিত করবে।